মেঘ ও সবুজের স্বর্গে

সাগর বিশ্বাস

গৌহাটি বা গুয়াহাটি হচ্ছে উত্তরপূর্ব ভারতের তোরণদ্বার। মেঘালয়ে ঢুকতে হলে এই দরজা ব্যবহার করাই বিধেয়। সড়কপথে গৌহাটি থেকে মেঘালয়- রাজধানী শিলং মাত্র একশো তিন কিলোমিটার। বাসে সময় লাগে সাড়ে তিনঘন্টা।

১৯৭৯ সালের জুন মাসে যখন প্রথমবার শিলং গিয়েছিলাম তখন আসাম ছিল অগ্নিগর্ভ । শিলঙেও সে আগুনের হলকা দাউ দাউ করছে। দুই দশক বাদে এই সেপ্টেম্বর মাসে দেখছি অসমসহ উত্তরপূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার জলে থৈ থৈ। শহর গৌহাটি সে তাণ্ডবে বিধবস্ত না হলেও সামগ্রিক ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। ১৪ তারিখে যখন শিলঙের পথে গৌহাটি পরিত্যাগ করলাম সেইদিন প্রভাতী কাগজে দেখেছি শুধুমাত্র কাজিরাঙা অভয়ারণ্যেই চাবিবশটি গণ্ডার, দুটি হাতি এবং পঁাচশো হরিণ বন্যার প্রকোপে প্রাণ হারিয়েছে।

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে এক সহকর্মী বন্ধু শিবানী জানতে চেয়েছিল শিলং নামটা কীভাবে কোথা থেকে এসেছে। বলতে পারিনি। ফিরে গিয়ে বলতে হবে, কথা দিয়ে এসেছি। বাসের মধ্যে বসে বসে সেই কথাটা আর একবার মনে পড়ল। গৌহাটি ছেড়ে ঘন্টা দেড়েক ছুটে আমাদের বাসটা নাঙপোহ্ নামক একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে সে। যাত্রীরা নেমে গিয়ে টয়লেট সেরে সামান্য জলখাবারসহ চা পান করে নিচ্ছেন। শিলং যাবার এই জ াতীয় সড়ক জি. এস. রোড বা গৌহাটি শিলং রোড বেশ প্রশস্ত, দাজিলিং -এর দুপাশের পাহাড়, ঝরনা, বনের সবুজ চে াখের শান্তি, মনের আরাম ছড়িয়ে দেয়। অথচ একদিন কত দুর্গমই না ছিল এই পথঘাট! ইতিহাস জানায় ১৮৬০ সালে সংঘটিত জয়ন্তিয়া বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত শিলঙের কোনও গুত্বই ছিল না। জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হত চেরাপুঞ্জি থেকে। কী কারণে শিলঙের গুত্ব বেড়ে গেল সে অন্য ইতিহাস। কিন্তু গুত্ব বাড়লে যোগাযোগ ব্যবস্থাও গুত্ব প ায়। ফলে তৎকালীন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের অনুমোদনক্রমে সত্তর মাইল রাস্তা নির্মিত হয়, গৌহাটি থেকে শিলং। তখনকার দিনের বাজার দরে খরচ হয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। দশ ফুট চওড়া সেই রাস্তায় গ ও ঘোড়ার গাড়ি চাল ানো হত। গোলাম হায়দার অ্যাণ্ড সন্স নামে একবাঙালি কোম্পানি সর্বপ্রথম মোটর - বাস চালু করে এ রাস্তায়। রাণী এবং মহারাণী নামাঙ্কিত তাদের দুখানা বাস নিয়মিত গৌহাটি শিলং যাতায়াত করত। গোলাম হায়দারের উত্তর পুষেরা এখনও শহরে বসবাস করছেন। আজকের এই প্রশস্ত পিচ ঢালা রাস্তায় আধুনিক আরামদায়ক মোটরযানে যেতে যেতে সেদিনের ইতিহাস মাঝে মাঝেই মনকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ চমক ভাঙে দু'পাশে থৈ থৈ জলরাশি দেখে। উমিয়াম লেক। চারিদিকে পাহাড়- ঘেরা বৃক্ষ-গুল্ম-শোভিত এই অনিন্দ্যসুন্দর হ্রদের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। বুঝলাম আর মাত্র পনেরো - যোলো কিলোমিটার গেলেই অ ামরা শিলং সুন্দরীর প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যাব।

পৌঁছলাম চারটে নাগাদ। পুলিশ বাজার টার্মিনাসে নেমেই দেখি কবি বন্ধু পীযূষ ধর ও অনুজ লেখক তাপস রায় আম াদের জন্য অপেক্ষমান। কিন্তু এ কোন শিলং? ১৯৭৯ সালে দেখা শিলঙের সাথে আজকের শিলং শহরের তফাতটা সহজেই চোখে পড়ে যায়। শুধু শহরেই বা কেন, চেরাপুঞ্জি যাবার পথে দেখেছি গ্রামাঞ্চলেও ট্রাডিশনাল পাহাড়িকাঠের ব াড়ি দ্রুত নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। পরিবর্তে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কংক্রিটের ঘরবাড়ি। অরণ্যশোভিত পাহাড়ি জনপদ তার সনাতন

ঐতিহ্য হারিয়ে এভাবেই কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। হয় তো এজন্য একদিকে তাকে কঠোর মুল্য দিতে হবে। আপ াতসুখের জন্য মানুষ এভাবেই ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে তোলে।
সেবার এই চেরাপুঞ্জির পথে নেহাতই কপাল জোরে সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ট্যাক্সিতে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন লামডিং কলেজের অধ্যাপিকা মন্দিরা দাস ও তাঁর এক বান্ধবী। সেদিন ঘন কুয়াশায়চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল। রাস্তার পাশেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ফগ লাইট জ্বালিয়ে ড্রাইভার কোনওমতে আমাদের নিয়ে চলেছেন। সেই প্রায়ান্ধকার পরিবেশে পেছেনের সীটে সাইডে বসে ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমাদের একঅধ্যাপক বন্ধুর আত্মীয়া শিপ্রা আর আমি বসেছিলাম সামনের সীটে। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি দরজা হাট করে খুলে গেছে আর পড়ন্ত একটি মানুষের হাত প্রাণপণে টেনে ধরে আছে আমার স্ত্রী। আমাদেররশিশু কন্যা কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটি চীৎকার। চেঁচিয়ে উঠেছি আমিও। ততক্ষণে তীব্র ঝাকুনি দিয়ে ট্যাক্সি থেমে গেছে। ট্যাক্সির দরজা এবার ঠিকমতো বন্ধ করতে করতে অধ্যাপিকা মাত্র দেড় হাত দূরের গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে সলজ্জে মাথায় হাত ঠেকিয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করেছিলেন।

এ যাত্রা আর ট্যাক্সি নয়। মেঘালয় ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশানের বাস। সকাল সাড়ে আটটায় পুলিশবাজার থেকে ছাড়ে। চেরাপুঞ্জি সূচিতে মোট ছ'সাতটা জায়গা দেখিয়ে বিকেল চারটেয় আবার পুলিশ বাজারে ফিরে আসে। মাথ াপিছু ভাড়া নববই টাকা। তবে কমপক্ষে পনেরো জন যাত্রী না হলে সেদিন আর যাত্রা হবে না। এম. টি. ডি. সি-র এই ব াসযাত্রায় বাড়তি সুবিধে হচ্ছে গাইড পরিষেবা। আমাদের গাড়িতে নির্মল ঘোষ নামে একজন কমবয়সী গাইড ছিল। ত্রিপুরার ছেলে। পড়াশুনো আছে। বেশ সপ্রতিভ। এরকম গাইড পেলে বেড়ানোর সুখ বেড়ে যায়।

শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব ছাপ্পান্ন কিলোমিটার। বত্রিশ কিলোমিটার একনাগাড়ে দৌড়ে বাস প্রথম যে জায়গায় এসে দম ছাড়ল তার নাম মৌডক। একটি চমৎকার ভিউপয়েন্ট। চেরাপুঞ্জি ট্রিপের প্রথম দর্শনীয় স্থান। নির্মল তার সুনির্মল ইংরেজি বয়ানে জায়গার বিবরণ শুনিয়ে কুড়ি মিনিট সময় বরাদ্দ করে নেমে এল। আমরা পার্বত্য প্রকৃতির রূপসায়রে অবগাহন সেরে পাশের দোকানের চায়ে গলা ভেজালাম। আবার রওনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি মেনেই রোড ছেড়ে ড ানদিকে অপেক্ষাকৃত স রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। বসতির মধ্য দিয়ে ধীরগতিতে আমরা এসে পৌঁছলাম রামকৃষ্ণ মিশনে। দেখা গেল, ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মিশনের মেইন বিল্ডিং এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত জহরলাল নেহর হাতে। প্র াসঙ্গিক ইতিহাস বলছে ১৯২৪ সালে শ্রীহট্টের প্রভানন্দ স্বামী (কেতকী মহারাজ) প্রথমে সেলাতে একটি মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেটাই পরে এখানে চলে আসে। এদিকে শিলঙেও ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত লাবান, জেলরে াড এবং মউখর-এর বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে মিশনের সেবামুলক কাজকর্ম চলতে থাকে। ১৯৩৪এ লাইমুখরায় জমি পাওয় ার পর ১৯৩৮ সালে সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় যেটা ১৯৭০ সালে পুনর্নির্মিত হয়েছে। এখানে আর একটি প্রাসঙ্গি ক তথ্য মনে রাখা দরকার। খাসি পাহাড়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সূত্রপ াত হয়। রাজচন্দ্র চৌধুরি, ব্রজেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৭৪ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় শিলং ব্রাহ্মসমাজ। সে সময় ড. লক্ষ্মীপ্রভা বোড় অসমিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্ম হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৮৭ সালে হেমন্তকুমারী চৌধুরির উদ্যোগে একটি মহিলা সমিতি এবং রামমোহন মহিলা লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার করার জন্য স্বয়ং শিবনাথ শস্ত্রী ১৮৮৯ সালে নীলমণি চক্রবর্তীকে শিলং পাঠিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ বিদ্যালয়, পাঠাগার, সভাগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ কিছু কল্যানমূলককাজকর্ম করলেও এ আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে কোনওদিন দানা বাঁধতে পারেনি। অবশেষে ১৯৪১ সালে নীলমণি চক্রবর্তীর মৃত্যুর সাথে সাথে এই পার্বত্য অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের শেষে সলতেটুকুও নির্বা পিত হয়েছে।
আমাদের পরবর্তী দ্রষ্টব্য নক্কালিকাই জলপ্রপাত। ১৭৫ মিটার উচচতাসম্পন্ন এই সুদৃশ্য প্রপাত নীচের নীলাভ জলরাশি আর পশ্চাদভূমির বিস্তীর্ণ পাহাড় ও সবুজ বনানীর প্রেক্ষাপটে দর্শকমন আবেগ-প্লাবিত করে দেয়। নির্মল জানিয়ে দেয় নক্কালিকাই ভারতের দ্বিতীয় উচচতম জলপ্রপাত।

গাড়িতে মহারাষ্ট্র থেকে আগত দুই গুহা অভিযাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল--- পাতিল আর কুলকার্নি। দীর্ঘময়োদি পরিকল্পনা নিয়ে দুজনে উত্তর পূর্ব ভারতের গুহা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। মাওস্মাই কেভ দেখে ওঁরাও বেশ পুলকিত। শোনা যায় একশো পঞ্চাশ মিটার গভীর এই প্রাকৃতিক চুনাপাথরের গুহাটি নাকি দুশো বছর আগে স্থানীয় গ্রামবাসীরাই আবিষ্কার করেছিল। গুহায় প্রবেশ করার জন্য টর্চ ভাড়া পাওয়া যায়। ১৯৮৭ সালে নীচে থেকে গুহামুখ পর্যন্ত সিমেন্টের সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে গুহামুখে পৌঁছানো এখন আর আগের মতো কষ্টকর নয়। টর্চের আলোয় ক্ষীণস্রোতা স্বচ্ছতোয়া ঝিরঝিরে জলের মধ্যে পা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে প্রকৃতির নিজের হাতে নির্মিত গুহাটির বিচিত্র অবয়ব দেখতে দেখতে বিপরীত প্রান্ত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

আমরা সেই প্রথম হল্ট মৌডকে চা খেয়েছিলাম। একন অনেকেরই আর একবার গলা ভেজানোর ইচ্ছে। দোকানে এসে দেখলাম আমাদের গাইড নির্মলকুমার মেঘালয় পুলিশের এসকর্ট টিম আর সুবেশা তণী দোকানির সাথে বেশ জমিয়ে বসেছে। আমি চা খাইনা শুনে মেয়েটি তো হেঁসেই বাঁচে না। বেড়াতে এসে চা খায়না এমন অদ্ভুত জীব সম্ভবত সে এই প্রথম দেখছে। বললাম---নাম কী তোমার? বলল, সুনদুক. মানে? বলতে পারলনা, শুধু হাসল। অগত্যা দুধ ছাড়া সামান্য লিকার খেতে পারি শুনে সে বেশ আশ্বস্ত হল। চায়ের রসে চুমুক দিতে দিতে মনে হচ্ছিল, নামের মানে যা-ই হোক, এই অরণ্য সাম্রাজ্যে অমন প্রাণচাঞ্চল্য আর উচ্ছল অনাবিল হাসি ওর মতো আদিবাসী রমণীর মুখেই মানায়।

এরপর মৌট্রপ। এখন একটি পাহাড় - শীর্ষ আছে, নাম জয়েন্ট ত্রনিকল বাস্কেট। জুম কিংবা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স না থাকলে ওই প্রকাণ্ড রাক্ষসের খাঁচাকে ক্যামেরাবন্দী করা যায় না। ভিউপয়েন্ট থেকে দেখা যায় শেলা রোড চলে গেছে সীমান্তের দিকে। বাংলা দেশ সীমান্ত। ডানদিকে সুরমা নদী, বাঁদিকে থারিয়া (নদী), সামনে লাইমস্টোন পাহাড়---ইছামতি। দূরে দেখা যায় ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টারী। খানিকক্ষণ চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে। এইনয়নাভিরাম দৃশ্য থাংখারাং পার্ক থেকেও দেখতে পাওয়া যায়। চোখের সামনে প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ললাইমস্টোন পাহাড়ের মাথায় জমাট মেঘ। সূর্যের আলো পড়লো পাহাড়ের শরীর রূপোলি সৌন্দর্যে মনোহর হয়ে ওঠে। এরই মাথায় একদিন ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগিজ, গ্রিক ও আর্মেনিয়ান বণিকেরা এই পার্বত্যরাজ্যে এসেছিল কতকাল আগে! খাসি পাহাড়ে ব্রিটিশ সরকার ঘাঁটি গাড়ার অন্তত ৩০ বছর আগে হেনরি ইংলিশ অ্যাণ্ড কোং এখানে রমরমা ব্যবসা করেছে লাইমস্টোনের।

চেরা বাজার এলাকা বেশ ঘিঞ্জি। বাড়ির পর বাড়ি, স স রাস্তা। স্থানীয় চেরি ফুলের মধু বেশ সুলভ। অনেকেই কিনে নিয়ে আসেন। ঘরে ঘরে কমলালেবুর গাছ। উঠোনের উপর ফলন্ত লেবু গাছের ভিড় বেশ লাগে দেখতে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল এই চেরাপুঞ্জিতেই। মূলত প্রতিকূল আহাওয়া আর প্রশাসনিক অসুবিধার জন্যই সদর দপ্তর শিলঙে নিয়ে আসা হয়। সে অন্য ইতিহাস।

চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের সর্বশেষ দ্রষ্টব্য হল মওস্মাই ফল্স। চমৎকার ভিউপয়েন্ট। সামনেই সেভেন সিস্টার্স ফল্স। পাহাড়ের মাথায় মাথায় ধূসর মেঘমালা। দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের কোলে মেঘ ও রৌদ্রের চমৎকার লুকোচুরি অদ্ভুত আবেশে মন ভরিয়ে দেয়। দোতলা রেঁস্তোরায় খাওয়া - দাওয়া পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নির্মলের ইঙ্গিতে আবার আমরা বাসে এসে উঠি। এবার ফেরার পালা। সামনে পুলিশের এসকর্ট গাড়ি। মেঘালয় তথা উত্তর - পূর্ব ভারতের ভাঙাচোরা আইন - শৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে এখন এটাই দস্তুর।

যে কোনও ভ্রমণপিপাসুর কাছেই শিলং একটি আদর্শ স্থান। সমুদ্র থেকে ১৪৯৬ মিটার উচচতায় অবস্থিত এ শহরের আবহাওয়া যেমন মনোরম, তেমনি মনোরম এর প্রাকৃতিক পরিবেশ। পাক্কা একশো বছর (১৯৭৪ - ১৯৭৪) গোটা আসামের রাজধানী থাকার সুবাদে শিলঙে সমস্ত রকম নাগরিক সাচ্ছন্দ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ১৯৭২ সালের

২১ জানুয়ারি খাসি, গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ২২,৪২৯ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড নিয়ে তৈরি হয় নতুন রাজ্য মেঘালয়। আসামের জন্য নতুন রাজধানী হয় দিসপুর আর মেঘালয়ের রাজধানী হিসেবে বহাল থাকে শিলং।

শহরে এবং সন্নিহিত স্থানে দেখার জায়গা আছে অনেকগুলি। যেমন, শিলং পিক, ওয়ার্ড লেক, ত্রিনোলিন ফল্‌স, উমিয়াম লেক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, লেডি হায়দারি পার্ক, গল্‌ফ কোর্স, মিউজিয়াম, এলিফ্যান্ট ফল্‌স, বিডন বিশপফল্‌স, সুইট ফাল্‌স, স্পেড ঈগল ফল্‌স ইত্যাদি। শুধু প্রপাত আর প্রপাত। শেষোক্ত প্রপাতটি কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে একটি 'স্মরণীয় দিন' এনে দিয়েছিল। প্রপাতটি কিন্তু সেদিন তাঁর দেখা হয়নি। দেখা হলনা অথচ দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হতে পারে। তাহলে গল্পটা বলতে হয়।

১৯৩৫ সাল। আসাম সরকারের এক পদস্থ আমলা-কন্যা সুপ্রভার সাথে বিভূতিভূষণের পরিচয় হয়। সুপ্রভা উচ্চশিক্ষিতা মার্জিত চি তণী। লাবানে তাঁদের বাড়ি সনৎকুটির। ১৯৩৬ সালে সুপ্রভার সাথে মিলিত হতে শিলং পৌঁছলে সুপ্রভা একদিন তাঁকে স্প্রেড ঈগল ফল্‌স দেখাতে নিয়ে যান। কিন্তু ঘন পাইন বনের মধ্যে যেতে যেতে তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেন।

তখনকার দিনে এসব জায়গায় দস্যু তস্করেরও ভয় ছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা স্প্রেড ঈগল ফলসের পথ হদিশ করতে পারছেন না। হঠাৎ সেই নির্জন অরণ্যে দুটি ষণ্ডামার্কা মানুষের আগমন তাঁদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। সুপ্রভা অসম্ভব ভয় পেয়ে যান। সে যাত্রা কোনওমতে বন থেকে বেরিয়ে দুজনে নিরাপদেই বাড়ি ফিরে আসেন। স্প্রেড ঈগল ফল্‌স দেখা না হলেও বিভূতিভূষণের স্মৃতির মণিকোঠায় এটা একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকে। আজ বিভূতিভূষণ নেই, কিন্তু সেদিনের সেই তন্বী তণী সুপ্রভা চৌধুরি এখন নববই বছরের বৃদ্ধা। এ প্রসঙ্গে বিভূতি-পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করলে বলেছিলেন, "ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। খুব স্নেহ করেন আমাকে। পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর কিছু রোমান্টিক অ্যাফেয়ার হয়েছিল, শুনেছি বিয়ের কথাও হয়েছিল, কিন্তু কোনও কারণে সেটা আর বাস্তবায়িত হয়নি।" সেই সন্ধ্যার বেড়ানো প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ নিজেই লিখেছিলেন, "কী ভাল লেগেছে আজ সন্ধ্যায় বনফুল ফোটা পাইন বনের পথে সুপ্রভার সঙ্গে বেড়ানোটা। আর কী সুন্দর দৃশ্য চারিধারে। ... জীবনে এ একটা স্মরণীয় দিন। যেন অন্য জগতে এসে গিয়েছি। শিলংয়ের শোভা অদ্ভুত তো বটেই, তাছাড়া সুপ্রবার মতো মমতাময়ী মেয়ের সাহচর্য ও সহানুভূতি ক'জন পায়?"

শিলঙে অবস্থানকালে সময় পেলে রোজই একবার ওয়ার্ড লেকে যাওয়া যায়। চারপাশে পাইনশোভিত এই কৃত্রিমলেকের জলে নৌকো ভাসাতে ভালো লাগে। আমরাও গেলাম একদিন। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ওয়ার্ড লেকের সেইশান্ত নিস্তরঙ্গ বুকের উপর ভাসতে ভাসতে মন বারবার পাড়ি জমাচ্ছিল পুরনো দিনের স্রোতে---ইতিহাসের খাঁড়িপথে। এই যে লেক যার শান্ত বুকে নাও ভাসিয়েছি, এককালে তার নাম ছিল 'হপকিনসনের পুকুর'। পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য আসামের তৎকালীন কমিশনার কর্ণেল হপকিনসন বানিয়েছিলেন। পরে স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড কমিশনার হয়ে এলে জলাশয়টিকে আরও বড় ও উন্নত করা হয় (১৮৯৩)। তখন থেকে এর নাম হয়ে যায় ওয়ার্ড লেক। কিন্তু এ কথাও ঠিক, তার এই বর্তমান শ্রীময়ী রূপের জন্য অপেক্ষা করতে হল আরও অনেকবছর - বলা যায়, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত, যখন আসামের গভর্ণর ছিলেন জয়রামদাস দৌলতরাম।

কখন যে মাথার ওপর মেঘ জমেছে কেউ খেয়াল করিনি। গায়ে জল পড়তেই বোঝা গেল আমরা পাহাড়ের চপলা বৃষ্টির হাতে ধরা পড়েছি। তাড়াতাড়ি কূলে উঠে আশ্রয় নিতে নিতেই ভিজে একশা। পাহাড়ি চপলা মেঘের স্বভাবই এরকম।
গোটা শহরের দৃষ্টিনন্দন ল্যাণ্ডস্কেপ দেখতে হলে শিলং পিকে উঠতেই হবে। রিলবং গেলে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য দুটি বাড়ি দেখা যায়। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে কবি যে বাড়িটায় ছিলেন, পাইনবনের মধ্যে সেই বাড়িটা এখন মেঘালয় সরকারের আর্ট অ্যাণ্ড কালচার বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। কাছেই জিৎভূমি। এ বাড়িতে ১৯২৩ সালের এপ্রিল থেকে

জুনমাস পর্যন্ত অবস্থান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্ভবত এখানে বসেই লিখেছিলেন ‘রক্তকরবী’। বাড়িটিবর্তমানে বিনোদ চক্রবর্তী নামে এক বাঙালি ভদ্রলোকের। তাঁর ছেলে ও পুত্রবধু বাস করেন এখানে। বাড়িদুটি দেখতে দেখতে অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথেরই কবিতার লাইন মনে পড়ে যায়, চিহ্ তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই কিংবা স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভ ারমুক্ত সে এখানে নাই।

শহরের কেন্দ্রস্থলেই রয়েছে মিউজিয়াম ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। অনেকেই দেখতে যান। কিন্তু প্রাঙ্গণের একপাশে যে মনুমেন্টটি দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে বিশেষ কারও চোখ পড়েনা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে উনিশ শতকে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এমনই তিনজন আদিবাসী শহীদের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত এই স্তম্ভ। তঁ ারা হলেন, উকিয়াং নাংবাহ্ (খাসি), তিরোত সিং (খাসি) এবং তোগান সংমা (গারো)। ১৮৬২ সালের ৩০ ডিসেম্বর যখন নাংবাহ্ ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিচেছন, তার অব্যবহিত পরেই আমরা দেখছি, জেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর চের াপুঞ্জি থেকে উঠে আসতে শিলঙে। কংগ্রেসের উদ্যোগে নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভ টি উদ্বোধন করেছেন রাজীব গান্ধি ১৯৮৫ স ালে। স্তম্ভগাত্রে ওই তিন শহীদকে ‘ব্রজ্জজন্সজ্জ স্সন্দ্র ঢস্স্তন্দ্বস্মান্দ্বস্তুন্দ্বস্তুন্দ্ব’ বলা হলেও আমরা জানি, যে সময়ে ওঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তখন সামগ্রিকভাবে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা দূরের কথা, কংগ্রেসের জন্মই হয়নি। প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী ভূমিপুত্রেরা তখন ইংরেজদের নিছক উড়ে এসে জুড়ে বসা অনুপ্রবেশকারী মনে করেই আক্রমণ করেছে। নিজের জন্মভূমি ও বাসস্থানের প্রতি অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার সহজাত আবেগ থেকে পরিচালিত এসব খণ্ডযুদ্ধ এক অর্থে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা হলেও বৃহত্তর দেশাত্মবোধ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। আন্দামানের আদিবাসীরাও কখনও কখনও পোর্টব্লেয়ারের ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট আক্রমণ করেছে। এসব আপন বাসভূমিতে অন্যের আধিপত্য অস্বীকার করার স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তি। তবে একথা মানতেই হবে যে আপন মা টির প্রতি ভালোবাসা আর মানুষের স্বাধিকারের প্রতি অনুরাগ তথাকথিত অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর চেয়ে ওইসব অরণ্য সন্তানদের কিছু কম ছিল না। ওদেরই এক উত্তর পুষ আলকা মারাক, একটি গারো মেয়ে, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, শিলঙে এক অনুষ্ঠানে তার গান শুনলাম। বিশুদ্ধ উচচারণ ও গায়কিতে সে রবীন্দ্রনাথের গান গাইল ‘দাঁড়াও আমার আঁখির অ াগে’। মনে হল লড়াই তো ওই ছোট্ট আদিবাসী মেয়েটাও করছে, সাংস্কৃতিক আত্মাভিমানের বিদ্ধে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বিদ্ধে!

অনেকে বলেন, নৈসর্গিক বৈভবের দিকে থেকে শিলং দার্জিলিংকেও ছাড়িয়ে যায়। এখানকার গল্ফ লিংক, এলিফ্যান্ট ফলস্ কিম্বা উমিয়াম লেকের কাছে দাঁড়ালে সেকথার যথার্থতা অনুভব করা যায়।

ফিরে আসার আগে অনিবার্যভাবেই শিবানীর কথা মনে পড়েছে। কলকাতায় দেখা হলেই সে জানতে চাইবে শিলং শহরের নাম ও উৎপত্তির কথা। এ সম্পর্কে মেঘালয় ট্যুরিজম জানায়“The capital city derives its name from the manifestation of the creator called ‘shyllong’ born to a peasant girl, but he bestowed the art of democratic governance and the rule of justice in the formation of the princely state of ‘shyllong’ (Hima Shyllong) which subsequently bifurcated into My lliem State and Khyrim State in 1830

ইতিহাস বলছে, খাসি যুদ্ধের পর ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসারের কার্যালয় নংখলাও (Nongkhlaw) থেকে চেরাপুঞ্জিতে সরিয়ে নেওয়া হলেও ১৮৫৮ সালেই রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য ডব্লিউ. জে. অ্যালেনের রিপোর্টদেখা গেল চেরাপুঞ্জিও উপযুক্ত স্থান নয়, সদর কার্যালয় অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া দরকার। ইংরেজরা কূটনৈতিক দিকথেকে আরও নিরাপদ জায়গা খুঁজতে লাগল। ইতিমধ্যে শু হয়ে গেল জয়ন্তিয়া বিদ্রোহ (১৮৬০-৬১)। পরিবহন ও সংযোগস্থাপনের দিক থেকে চেরাপুঞ্জি একেবারেই অনুপযুক্ত প্রমাণ হয়ে গেল। ১৮৬২ সালেই নতুন স্থান নির্বাচনের জন্য একটি উচচক্ষমত াসম্পন্ন কমিটি গঠিত হল। এই কমিটির মতামত, খাসি - জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন রাওল

াটের সার্ভে রিপোর্ট, খতিয়ে দেখে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অবশেষে জেলা সদর চেরাপুঞ্জি থেকে ইয়োদো তে স্থানান্তর করার অনুমতি দেয়। শিলং প্লেটো থেকে উয়োদোর অবস্থান ন'শো ফুট নীচে। এরপর শিলং এবং ইয়োদোতে কীভাবে সিভিল ও মিলিটারি এশটাব্লিশমেন্ট গড়ে উঠতে পারে, স্যানেটোরিয়াম হতে পারে, কীভাবে জমি সংগ্রহ ও বন্টন করা হবে, এসব ন ানান বিষয়ে ভাবনাচিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। আসামের তৎকালীন কমিশনার কর্ণেল হপকিনসন, খাসি - জয়ন্তিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনার মেজর এইচ. এস. বিভার, বার্কলে প্রমুখ উচচপদস্থ অফিসারেরা এ কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। অবশেষে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অনুমোদনক্রমে Myllien Syiemship তথা রাজাদের কাছ থেকে আট হাজার চারশো তেত্রিশ টাকায় দুহাজার চারশো নিরানববই একর জমি (শিলং ও ইয়োদো সহ) কিনে নেওয়া হল। পরে ইয়োদো নামটা বিলুপ্ত হয়। ড. বাসুদেব দত্তরায় জানিয়েছেন,"Yeodo was renamed shillong in the evening hours of 28 April, 1866 by Col. Holpkinson as the name Yeodo might create confusion." পুরনো দিনের কথা যঁ ারা জানেন, তাঁরা একবাক্যে বলেন শিলং ছিল ওই হপকিনসন সায়েবের মানস - সন্তান।

ফেরার দিন সকাল থেকেই মেঘালয়ের আকাশ ছিল মেঘের ভারে গম্ভীর। এসেছিলাম বন্যার সময়, ফিরছি যখন তখনও কোথাও কোথাও বন্যার তাণ্ডব রয়েছে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর বিহারের এই বন্যা প্রসঙ্গে সেদিনের শিলং টাইমস্ লিখল, "For the first time in five decades and more all the rivers and their tributaries are over-flowing, bringing unfold misery to over ten million people. It is 'a pathetic site, a complete deluge' stated Union Minister of State for Agriculture." তবু থমথমে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যখন আমাদের বাস গৌহাটি অভিমুখে ধাবমান, চারপাশের সেই বর্ষাভারাক্রান্ত মেঘরাশির অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, তাকে ঘিরে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ানুভূতির কথা বোধহয় কোনওদিন ভোলা যাবেনা। এ জন্যই বুঝি নাম তার মেঘালয়, মেঘের আলয়।